সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তনে ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকা

অবস্থান অনুযায়ী ভূমিকা

শুক্রবারের সকালবেলায় স্টেডিয়ামে ফুটবল খেলা হবে। কে কে যাবে তাই নিয়ে ক্লাসে আলাপ হচ্ছিল। প্রায় সবাই যেতে চায়। হঠাৎ সুমন কাগজ দিয়ে একটা মস্ত গোঁফ বানিয়ে গম্ভীরভাবে বলল, আমি যেখানে খুশি যেতে পারি, কারোর অনুমতি লাগে না। ওর ভাবভঙ্গি দেখে বন্ধুরা সব হেসেই কুটিপাটি! সুমন ধমক দিয়ে বলল, এত হাসির কী হলো? ধমক শুনে ওরা আরও জোরে হেসে উঠল। তবে সবাই স্বীকার করল, সুমনকে দারুণ মানিয়েছে! গণেশ বলল, এ রকম গোঁফ লাগিয়ে সত্যি সত্যি বাবার মতো বড় হওয়া গেলে আমিও লাগাতাম।

এই সময় খুশি আপা এলেন। তিনি বললেন, ছোটবেলায় আমিও এ রকম ভেবেছি। খুশি আপা ওদের ফুটবল মাঠের ফরমেশনের একটা ছবি দেখলেন।

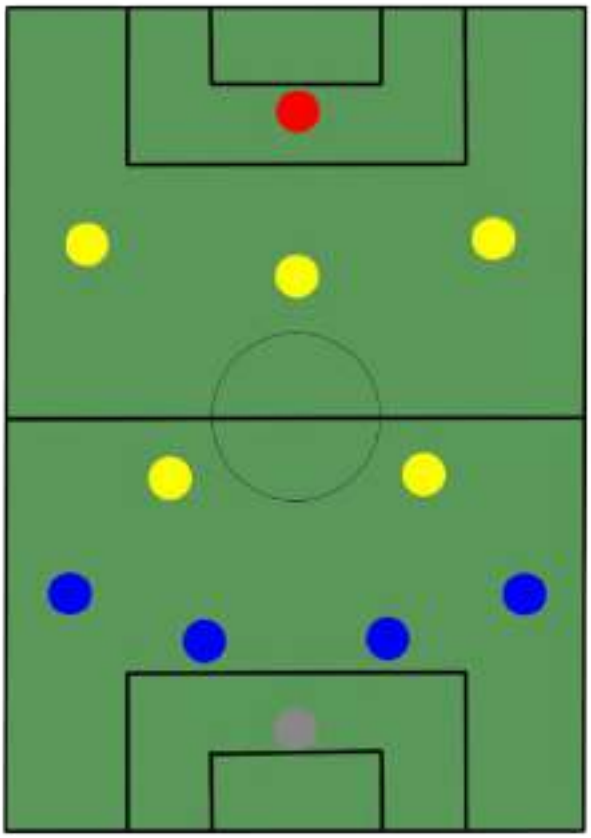

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এখানে গোলরক্ষকের অবস্থান কোথায়? আনাই জবাব দিল, গোলরক্ষকের অবস্থান নিজেদের গোলপোস্টের সামনে। খুশি আপা বললেন, আর সেন্টার ফরোয়ার্ডের অবস্থান? হাচ্চা বলল, সেন্টার ফরোয়ার্ডের অবস্থান বিপক্ষ দলের গোলপোস্টের কাছে। খুশি আপা বললেন, চমৎকার! এবার বলো, ফুটবল খেলায় গোলরক্ষকের ভূমিকা কী? মামুন বলল, বিপক্ষ দলকে গোল দিতে বাধা দেওয়া। “বাহ্! সেন্টার ফরোয়ার্ডের ভূমিকা কী, বলো তো?” খুশি আপা আবার প্রশ্ন করলেন। মাহবুব বলল, গোল দেওয়া।

এবারে খুশি আপা বললেন, যদি এমন হয়, খেলার সময় এরা যার যার অবস্থানে থাকল ঠিকই, কিন্তু হঠাৎ গোলরক্ষকের মনে হলো, “আর কত গোল ঠেকাব! এবার বরং একটা গোল দিই। ” অন্যদিকে সেন্টার ফরোয়ার্ডের মনে হলো, “সারা জীবন কি কেবল গোলই করে যাব! এবার বরং দএকটা গোল ঠেকাই। ” তারা তখন নিজেদের ভূমিকা বদলে ফেলল, তাহলে কেমন হবে? তিনি বোর্ডে একটা ছক আঁকলেন।

	অবস্থান	মূল ভূমিকা	পরিবর্তিত ভূমিকা
গোলরক্ষক	নিজেদের গোলপোস্টের সামনে	গোল দিতে বাধা দেওয়া	গোল দেওয়া
সেন্টার ফরোয়ার্ড	প্রতিপক্ষের গোলপোস্টের সামনে	গোল দেওয়া	গোল দিতে বাধা দেওয়া

তারপর বললেন, আবার যদি অন্যরকম হয়। তারা দুজনই ভাবল, “এক জায়গায় আর কত খেলব! যাই, একটু অন্যদিকে খেলি। ” গোলরক্ষক আর সেন্টার ফরোয়ার্ড দুজনে দুজনার অবস্থান অদল বদল করল কিন্তু তাদের ভূমিকা ঠিক থাকল। তাহলেই বা কী ঘটবে? তিনি আরও একটা ছক আঁকলেন।

	মূল অবস্থান	পরিবর্তিত অবস্থান	ভূমিকা
গোলরক্ষক	নিজেদের গোলপোস্টের সামনে	প্রতিপক্ষের গোলপোস্টের সামনে	গোল দিতে বাধা দেওয়া
সেন্টার ফরোয়ার্ড	প্রতিপক্ষের গোলপোস্টের সামনে	নিজেদের গোলপোস্টের সামনে	গোল দেওয়া

ছকদুটো দেখে ওরা হেসে ফেলল। আদনান বলল, শুক্রবারের খেলায় যদি এ রকম ঘটনা ঘটে তাহলে কী ভীষণ কাণ্ড হবে! সালমা বলল, অত কাণ্ডের কোনো দরকার নেই। যে যার অবস্থানে থেকে নিজের ভূমিকা ঠিকঠাক পালন করলে আমরা মজা করে খেলা দেখতে পারব।

আমরাও ছক দুটো ভালো করে দেখি আর আলোচনা করি, ইচ্ছেমতো অবস্থান কিংবা ভূমিকা বদলালে কী ঘটনা ঘটবে।

ছোটবেলার অবস্থান ও ভূমিকা বড় হলে বদলায়

খুশি আপা বললেন, অবস্থান আর ভূমিকা বদল নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা গল্প আছে। তিনি ওদের গল্পটা শোনালেন।

ইচ্ছা পূরণ

সুবলচন্দ্রের ছেলে সুশীলচন্দ্র ভারি দস্যি। সবাইকে জ্বালিয়ে মারত। সেদিন ছিল ওদের পাড়ায় জমজমাট উৎসব। সন্ধ্যায় বাজি পোড়ানো হবে। সুশীলের ইচ্ছে সেখানেই সারা দিন কাটাবে। তাই সে বুদ্ধি করে বাবাকে বলল, আমার পেট ব্যাথা। আজ স্কুলে যাব না। বাবা সবই বুঝতে পারল। তবু বলল, আজ তাহলে ঘর থেকে বের হয়ে কাজ নেই। তোর জন্য লজঞ্চুস (চকলেট) এনেছিলাম সেটাও আর খেতে হবে না। বরং পাঁচন খেয়ে সারা দিন শুয়ে থাক। পাঁচন একটা ভয়ানক তিতা ওষুধ। পাঁচনের ভয়ে সুশীলের পেটব্যথা সেরে গেল, কিন্তু সুবল তাকে ছাড়ল না। জোর করে পাঁচন খাইয়ে ঘর বন্ধ করে চলে গেল। মনের দু:খে সুশীল সারা দিন কাঁদল আর ভাবল, যদি আমার বাবার মতো বয়স হতো, তাহলে কী মজা হতো! যা ইচ্ছে তাই করতে পারতাম। এদিকে সুবল ভাবল, যদি ছেলেবেলাটা ফিরে পেতাম, তাহলে সারা দিন শুধু লেখাপড়া করতাম। ইচ্ছা ঠাকরুণ সেকথা শুনে ভাবলেন, ঠিক আছে। এদের যেমন ইচ্ছে তেমনই হোক।

পরদিন সকালে সুবল ঘুম থেকে উঠে দেখে তার টাক মাথায় চুল গজিয়েছে, পড়ে যাওয়া দাঁতগুলোও গজিয়েছে। মুখে একটাও গোঁফদাড়ি নেই। সে একদম সুশীলের মতো ছোট হয়ে গিয়েছে। অন্যদিকে সুশীলের হলো উল্টোরকম ব্যাপার। মাথায় চকচকে টাক, মুখে গোঁফদাঁড়ির জঞ্জাল, কয়েকটা দাঁতও পড়ে গেছে। আর শরীরটা কত বড় হযে গেছে! তাদের মনের একটা ইচ্ছা পূরণ হলো ঠিকই কিন্তু বাকি ইচ্ছাগুলো হারিয়ে গেল। সুশীল ভাবত বাবার মতো হলে ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়াতে পারবে, সারা দিন হাডুডু খেলা, পুকুরে ঝাঁপ দেওয়ায় আর গাছে চড়ায় কোনো বারণ থাকবে না। কিন্তু বড় হয়ে তার আর এসব করতেই ইচ্ছে হলো না।

তবুও একবার চেষ্টা করে দেখতে গিয়ে গাছের ডাল ভেঙে পড়ে গেল। পথচলতি লোকেরা বুড়ো মানুষের এই ছেলেমানুষী কান্ড দেখে হেসে গড়িয়ে পড়তে লাগল। সুশীলের কত প্রিয় ছিল লজঞ্চুস, এক টাকায় একরাশ লজঞ্চুস কিনে এনে একটা মুখে দিয়ে স্বাদটা ভারি বিশ্রী লাগল। এমনকি নিজের বন্ধুদের দেখেও ছেলেমানুষ আর বিরক্তিকর বলে মনে হলো।

এদিকে যে সুবল ভেবেছিল আবার ছোট হতে পারলে কত পড়াশোনা করবে, এমনকি সন্ধ্যাবেলায় ঠাকুমার কাছে গল্প শোনা বাদ দিয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে রাত দশটা-এগারোটা পর্যন্ত কেবলই পড়া মুখস্থ করবে। অথচ এখন সে আর কিছুতেই স্কুলে যেতে চায় না। সারা দিন খেলার জন্য অস্থির থাকে। সুশীল তাকে জোর করে স্কুলে পাঠায়। কাজের সময় গোলমাল করলে একটা স্লেট নিয়ে অঙ্ক করতে বসিয়ে দেয়, এমনকি বন্ধুদের সঙ্গে দাবা খেলার সময় ছেলেকে শান্ত রাখার জন্য বাড়িতে একজন মাস্টারও রেখে দিল। তবুও বাবা সুবলকে সামলাতে গিয়ে ছেলে সুশীল হিমশিম খায়।

পুরোনো অভ্যাসের কারণে দুজনের মাঝে মাঝেই আবার ভুল হয়ে যায়। সুশীল চুল আঁচড়াতে গিয়ে দেখে মাথায় চুলই নেই। হঠাৎ করে লাফ দিতে গিয়ে হাড়গোড় টনটন করে ওঠে। আগের অভ্যাসমতো পাড়ার আন্দিপিসির মাটির কলসে ঠন করে ঢিল ছুড়ে মেরে পাড়ার লোকের তাড়া খায়। এদিকে সুবল বড়দের তাস-পাশার আড্ডায় বসতে গিয়ে ধমক খেয়ে ফিরে আসে। ভুল করে মাস্টারের কাছে তামাকটা চেয়ে মার খায়। নাপিতকে বলে, কদিন আমার দাড়ি কামাতে আসিসনি যে! বুড়োর ছেলে মানুষি আর ছোট ছেলের পাকামি দেখে লোকজন খুব বিরক্ত হয়।

আগে সুশীল কোথাও যাত্রাগান হওয়ার খবর পেলে ঠান্ডা-বৃষ্টি যা-ই থাক, বাড়ি থেকে পালিয়ে সেখানে হাজির হতো। এখন সেই কাজ করতে গিয়ে জ্বর-সর্দি-কাশি বাধিয়ে তিন সপ্তাহ বিছানায় শুয়ে থাকল। চিরকালের অভ্যাসমতো পুকুরে স্নান করতে গিয়ে এমন অসুখ বাধাল যে ছয় মাস চিকিৎসা করতে হলো। তারপর সে আর সুবলকেও পুকুরে নামতে দেয় না।

সুবল-সুশীলের আর ভালো লাগছিল না। তারা কোনোমতে আগের মতো হতে পারলে বেঁচে যায়। ইচ্ছা ঠাকরুণ ওদের ইচ্ছার কথা জেনে আবার দুজনকে আগের মতো করে দিলেন। সুবল আবার বাবা হয়েই গম্ভীর হয়ে সুশীলকে বলল, ব্যাকরণ মুখস্ত করবে না? সুশীল আগের মতোই জবাব দিল, বই হারিয়ে গিয়েছে।

গল্পটা বলার পর খুশি আপা বললেন, আমাদের সুমন যেমন গোঁফ লাগিয়ে বড় মানুষ সেজেছে, 'ইচ্ছা পূরণ' গল্পে এ রকম ঘটনা কার ক্ষেত্রে ঘটেছে? অন্বেষা হেসে বলল, সুশীলচন্দ্র সুমনের

মতো ছেলে থেকে বাবা হয়েছে। মামুন বলল, সুবলচন্দ্রের ক্ষেত্রে আবার উল্টো ঘটনা ঘটেছে, সে বাবা থেকে ছেলে হয়ে গিয়েছে। খুশি আপা বললেন, ঠিক তাই। চলো, আমরা একটা ছক পূরণ করে বুঝে নিই, ছেলে হিসেবে সুশীল-সুবল কেমন ছিল আর বাবা হিসেবে তারা কেমন হয়েছিল। ওরা আলোচনার মাধ্যমে বোর্ডে নিচের ছকটি পূরণ করল:

অদল-বদল	
সুশীলচন্দ্র যখন ছেলে	সুশীলচন্দ্র যখন বাবা
পড়াশোনায় ফাঁকি দেয় বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে, গাছে চড়তে ভালো লাগে	ছেলেকে পড়তে বসায় ছেলেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করে
সুবলচন্দ্র যখন ছেলে	সুবলচন্দ্র যখন বাবা
পড়াশোনায় ফাঁকি দেয় বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে, গাছে চড়তে ভালো লাগে	ছেলেকে পড়তে বসায় ছেলেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করে

আমরাও ওদের মতো আলোচনা করে ওপরের ছকটি পূরণ করি।

ছক পূরণ শেষে ওরা নিচের প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করল

সুবলচন্দ্র আর সুশীলচন্দ্রের কী রকম বদল হয়েছিল?

যখন তারা বাবা তখন তাদের কাজ, আচরণ কেমন ছিল?

যখন তারা ছেলে তখন তারা কেমন?

লোকজন ওদের ওপর বিরক্ত হয়েছিল কেন?

আলোচনা শেষে ওরা বুঝতে পারল, সুবলচন্দ্র ও সুশীলচন্দ্রের অবস্থান বদল হওয়ার পর তাদের ভূমিকারও বদল হয়েছে। বাবা হিসেবে সুবলচন্দ্র যা করতে পারে, ছেলে হিসেবে তা পারে না। যেমন গোলরক্ষকের অবস্থানে থেকে সেন্টার ফরোয়ার্ডের ভূমিকা পালন করা যায় না। আবার সুশীলচন্দ্রের ক্ষেত্রেও একই কথা সত্যি। বাবা ও ছেলের অবস্থান অনুযায়ী ভূমিকা পালনের কিছু সামাজিক রীতি-নীতি আছে। সেগুলো মেনে

না চললে সমাজের লোকজন বিরক্ত হয়, তেড়ে আসে। ফুটবলের মাঠেও নিয়ম নীতি মেনে না খেললে এ রকম কাণ্ড ঘটে।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অবস্থান ও ভূমিকার বদল হয়

খুশি আপা বললেন, আমরা তো গল্পে দেখলাম বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অবস্থান বদলায় আর অবস্থান বদলালে ভূমিকাও বদলায়। কিন্তু বাস্তবেও এ রকম হয় কি না, আমরা একটা অনুসন্ধানী কাজের মাধ্যমে পরীক্ষা করে দেখতে পারি, ছোটবেলায় আর পরিণত বয়সে মানুষের অবস্থান ও ভূমিকা কেমন হয়। তথ্য সংগ্রহের জন্য নিজেদের পরিবারের লোকজনসহ আশপাশের পাঁচজন বড় মানুষের সাক্ষাৎকার নিতে পারি। আমরা বিভিন্ন পেশার, বিভিন্ন বয়সের, বিভিন্ন অর্থনৈতিক অবস্থার মানুষের সঙ্গে কথা বলব। যত ভিন্ন ভিন্ন রকমের মানুষের সাক্ষাৎকার নিতে পারব, তত ভালোভাবে বিষয়টা বুঝতে পারব। সমাজের সব রকমের মানুষের ক্ষেত্রে এই বিষয়টা সত্যি কি না, জানা যাবে।

সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য ওরা আলোচনার মাধ্যমে এ রকম একটা ছক তৈরি করল:

বিভিন্ন বয়সে আমার অবস্থান ও ভূমিকা	
নাম:	পেশা:
বয়স:	লিঙ্গ:
স্কুলে পড়ার বয়সে আমি যা করতাম	এখন আমি যা করি

ওরা দল তৈরি করে অনুসন্ধানী কাজটি করল। তারপর বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে ফলাফল উপস্থাপন করল।

আমরাও ওদের মতো অনুসন্ধানী কাজটি করি।

উপস্থাপন শেষে ফ্রান্সিস বলল, আমরা যে ভাবছিলাম, বড় হলে খেলা দেখতে যেতে কারোর অনুমতি লাগবে না। কত স্বাধীনতা! কিন্তু আসলে বড়দের অবস্থানে যে ভূমিকা পালন করতে হয়, তাতে দায়িত্বও বেশি থাকে। নীলা বলল, বাড়িতে, অফিসে, ক্লাবে, বাজারে নানা জায়গায় তাদের অনেকগুলো অবস্থানে বিভিন্ন ভূমিকা পালন করতে হয়। শিহান বলল, ছোটদের ক্ষেত্রেও সে কথা সত্যি। খুশি আপা বললেন, কথাটা আর একটু বুঝিয়ে বলবে? “বাড়িতে আমরা ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন ইত্যাদি অবস্থানে একাধিক ভূমিকায় থাকি, আবার স্কুলে এসে ছাত্র, বন্ধু— এসব অবস্থানে ভূমিকা পালন করি। ” শিহান জবাব দিল। খুশি আপা আনন্দিত হয়ে বললেন, দারূণ বলেছ তো! আরও বললেন,

এই যে আমরা বিভিন্ন জায়গায় মানুষের সঙ্গে মেলামেশা বা যোগাযোগ করি, যে পরিবেশ-পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে সেটা করি তাকে ‘সামাজিক প্রেক্ষাপট’ বলে।

আয়েশা বলল, আমরা বিভিন্ন সামাজিক প্রেক্ষাপটে নিজের আচরণ বিশ্লেষণ করে দেখতে পারি, অবস্থান অনুযায়ী ভূমিকার কী রকম বদল হচ্ছে। সিয়াম বলল, আমরা কমিক স্ট্রিপ বানিয়ে বিষয়টা সুন্দরভাবে প্রকাশ করতে পারি।

বিভিন্ন সামাজিক প্রেক্ষাপটে আমার অবস্থান ও ভূমিকা

এরপর ওরা শিরোনাম আর কথার বেলুন দিয়ে কার্টুন একে নিজেদের অভিজ্ঞতাগুলো ক্লাসে উপস্থাপন করল।

বাড়িতে আমি (ঘর গোছানো, ঘুমানো, ছোট ভাই/বোনের সঙ্গে খেলার ছবি, স্পিচ বাবলে লেখা) ছোট বোনকে গল্প শোনাই	শ্রেণিকক্ষে আমি (হাত তুলে কথা বলা, বন্ধুদের সঙ্গে কাগজ পেন্সিল রঙ কাচি দিয়ে প্রজেক্ট ওয়ার্ক করার ছবি, স্পিচ বাবলে লেখা) বন্ধুদের সঙ্গে কাজ করি
খেলার মাঠে আমি	বন্ধুদের আড্ডায় আমি

আমরাও ওদের মতন কার্টুন একে ‘বিভিন্ন সামাজিক প্রেক্ষাপটে নিজের অবস্থান ও ভূমিকা’ প্রকাশ করি।

ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক অবস্থান ও ভূমিকা

সাবা বলল, আমাদের যেমন আলাদা আলাদা সামাজিক প্রেক্ষাপটে আলাদা আলাদা অবস্থান ও ভূমিকা আছে, আমরা যে পরিবারের আর আশপাশের মানুষের সাক্ষাৎকার নিলাম, তাদেরও তো ছোটবেলায় এ রকম সামাজিক প্রেক্ষাপট অনুযায়ী বিভিন্ন অবস্থান আর বিভিন্ন ভূমিকা ছিল। অন্বেষা বলল, বয়স বাড়ার সাথে সাথে তাদের অবস্থান বদলেছে, অবস্থানের পরিবর্তন ঘটায় ভূমিকারও বদল ঘটেছে। “বড় হয়ে কি তাদের সবার অবস্থান আর ভূমিকা একরকম হয়েছে?” খুশি আপা প্রশ্ন করলেন। গণেশ বলল, ব্যক্তির যেমন বয়সভেদে আলাদা অবস্থান ও ভূমিকা থাকে, তেমনি ব্যক্তিতে ব্যক্তিতেও অবস্থান আর ভূমিকার তফাত আছে। সালমা বলল, বড়দের সবার অবস্থান আর ভূমিকা একরকম না। মা যা করে বাবা সেটা করে না। মাহবুব বলল, আমাদের এলাকার জনপ্রতিনিধি যা যা করেন, দোকানদার সেটা করেন না। একজন অভিনেতা যা করতে পারেন, মসজিদের ইমাম সাহেব তা করতে পারেন না; সমাজের মানুষও সেটা মেনে নেবে

না। আনুচিং বলল, ধনী আর দরিদ্র মানুষের অবস্থান ও ভূমিকায়ও পার্থক্য হয়। আমি একজন শিল্পপতির সাক্ষাৎকার নিয়েছি। তিনি ছোটবেলায় দরিদ্র ছিলেন; অন্যের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। এখন তিনি দরিদ্রদের পড়াশোনা, চিকিৎসা ইত্যাদির খরচ দেন। বুশরা বলল, আমি একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের সাক্ষাৎকার নিয়েছি। আমি তাকে ব্যক্তির অবস্থান এবং ভূমিকা সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতার কথাগুলো বলেছি। তার সঙ্গে করা আলাপ আর আজকের অভিজ্ঞতা মিলিয়ে আমি বুঝেছি:

মানুষের সঙ্গে মানুষের কথাবার্তা, কাজ, ভাবের বিনিময় ইত্যাদি যোগাযোগ বা মিথস্ক্রিয়ার ফলে প্রতিষ্ঠান (পরিবার, বিদ্যালয়, আমলাতন্ত্র, ধর্ম, রাজনৈতিক দল) এবং গোষ্ঠী (খেলার সঙ্গী, ফুটবল টিম, প্রতিবেশী) তৈরি হয়। এই প্রতিষ্ঠান ও গোষ্ঠীতে ব্যক্তি অবস্থান (status) করে ও ভূমিকা (role) পালন করে।

ব্যক্তির অবস্থান দুই রকমের হতে পারে:

- অর্জিত- যা ব্যক্তি সক্ষমতা ও চেষ্টা দ্বারা আয়ত্ত করে। যেমন- বিচারপতির পদ, প্রধানমন্ত্রীত্ব, খেলোয়াড়
- অর্পিত- জন্মসূত্রে বা প্রাকৃতিকভাবে প্রাপ্ত বিষয়। যেমন- নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ, হরিজন-ব্রাহ্মণ

অবস্থান অনুযায়ী ব্যক্তির যে অধিকার ও দায়িত্ব থাকে তাকে আমরা ভূমিকা বলি। অন্যভাবে বলা যায়, একজন মানুষের অবস্থান অনুযায়ী সমাজ তার কাছে যে আচরণ প্রত্যাশা করে সেটিই তার ভূমিকা। তাই সুবল যখন ছেলে হয়েছিল, তখন মাস্টারের কাছে তামাক চেয়ে মার খেয়েছিল । প্রত্যেক মানুষের একই সময় আবার জীবনের বিভিন্ন সময় পারিবারিক, পেশাগত ইত্যাদি বিভিন্ন সামাজিক প্রেক্ষাপটে অনেকগুলো অবস্থান ও ভূমিকা থাকে।

একই সমাজের সকল মানুষের অবস্থান ও ভূমিকা এক নয়। একজন মানুষের অবস্থান নির্ধারিত হয় তার পরিচিতি, সুনাম, পদ, ক্ষমতা, অর্থনৈতিক অবস্থা, পারিবারিক মর্যাদা, বয়স, লিঙ্গ ইত্যাদির ভিত্তিতে। একজন মানুষকে সমাজের অন্যান্য মানুষ কীভাবে মূল্যায়ন করবে, কতটা সম্মান ও গুরুত্ব দেবে তা তার সামাজিক অবস্থানের ওপর নির্ভর করে।

আলোচনা শেষে আদনান বলল, আমাদেরও তাহলে বড় হয়ে অবস্থান এবং ভূমিকা বদলাবে। আয়েশা বলল, আপনা আপনি সব বদলাবে তেমনটা নয়, আমাদের নিজেদেরও পছন্দের অবস্থান অর্জন করতে হবে। রনি বলল, আমরা তো সুশীলের মতো এক রাতে বড় হব না, ধীরে ধীরে বাড়ব, ধীরে ধীরে পছন্দের অবস্থান তৈরি করব। সাবা হেসে বলল, সে-ই ভালো। তাহলে আর হঠাৎ লাফিয়ে পড়ে হাড়গোড় ভাঙবে না। সবাই হেসে উঠল।

খুশি আপা বললেন, আমরা তো এখনকার সময়ের বিভিন্ন সামাজিক প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকা দেখলাম। এবার একটু অতীতে ফিরে দেখি, সেই সময় বিষয়গুলো কেমন ছিল। তিনি ওদের ষষ্ঠ শ্রেণির অনুসন্ধানী পাঠ থেকে মিশর, মেসোপটেমিয়া, গ্রিক এবং রোমান সভ্যতা সম্পর্কে পড়ে আসতে বললেন।

নানা সময়ের সামাজিক প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকা

পরের দিনের ক্লাসে খুশি আপা ওদের একটা ছবি দেখালেন। সুমন বলল, এইরকম একটা ছবি আমরা ষষ্ঠ শ্রেণির অনুসন্ধানী পাঠ-এ দেখেছি। রূপা বলল, প্রাচীন মিশরের সমাজে কাজ অনুযায়ী মানুষে মানুষে এ রকম

শ্রেণিবিভাগ ছিল।

মামুন বলল, এই পিরামিডের সবচেয়ে নিচে যাদের দেখছি, প্রাচীন মিশরীয় সমাজে তাদের অবস্থান ছিল সবচেয়ে নিচে, সম্মান আর সম্পদও ছিল সবচেয়ে কম। তাদের ভূমিকা ছিল সেবকের, অর্থাৎ অন্যের সেবা করাই ছিল তাদের কাজ। শিহান বলল, পিরামিডের সবচেয়ে ওপরে আছে রাজা। সমাজে তার অবস্থান এবং সম্মান ছিল সবচেয়ে ওপরে। তার সম্পদও ছিল সবচেয়ে বেশি। তার ভূমিকা ছিল শাসকের।

খুশি আপা বললেন, প্রাচীন মিশরীয় সমাজের মতো আমাদের সমাজেও তো নানা রকম মানুষ আছে—গৃহকর্মী, রিকশাওয়ালা, ডাক্তার, ইমাম, সরকারী কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, সাহিত্যিক, খেলোয়াড়, অবসরপ্রাপ্ত মানুষ, বিজ্ঞানী। তাদের পদ, ক্ষমতা, অর্থনৈতিক অবস্থা, পারিবারিক মর্যাদা, বয়স, লিঙ্গ ইত্যাদির আছে রকমফের। আমরা এখনকার সামাজিক প্রেক্ষাপটে তাদের অবস্থান আর ভূমিকাও খুঁজে দেখতে পারি। “আমরা একটা দলীয় অনুসন্ধানী কাজ করতে পারি” নীলা প্রস্তাব দিল। সবাই মিলে এ বিষয়ে আলোচনা করে তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি প্রশ্নমালা তৈরি করল।

১.

২.

৩.

৪.

‘যৌক্তিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো’ অধ্যায় থেকে শেখা অনুসন্ধানের ধাপ অনুযায়ী অনুসন্ধানী কাজ করল এবং কাজের ফলাফল বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে উপস্থাপন করল।

চলো এবার ‘যৌক্তিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় কীভাবে?’ অধ্যায় থেকে শেখা অনুসন্ধানের ধাপ অনুযায়ী অনুসন্ধানী কাজটি করে বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে ফলাফল উপস্থাপন করি। তার পর নিচের ছক ব্যবহার করে প্রাচীন মিশরের সমাজের মানুষের সামাজিক ভূমিকার সাথে বর্তমান সময়ের সমাজের মানুষের ভূমিকার মিল-অমিল খুঁজে বের করি।

প্রাচীন মিশরের মানুষের সমাজের ভূমিকার সাথে বর্তমান সময়ের সমাজের মানুষের ভূমিকার মিল	প্রাচীন মিশরের মানুষের সমাজের ভূমিকার সাথে বর্তমান সময়ের সমাজের মানুষের ভূমিকার অমিল

সামাজিক প্রেক্ষাপটের বদল হলে ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকা বদলায়

খুশি আপা জানতে চাইলেন, সামাজিক প্রেক্ষাপট কি সবসময় একই রকম থাকে? ওরা বলল, প্রাচীনকালের সামাজিক প্রেক্ষাপট আর আজকের প্রেক্ষাপট একরকম না। হাচ্চা বলল, সব কালের সমাজে বয়স অনুযায়ী মানুষের অবস্থান এবং ভূমিকার বদল হয়। কিন্তু সামাজিক অবস্থানের শ্রেণিভেদ সবসময় ছিল না। আপা বললেন, সমাজের কোনো একটি শ্রেণির আজকের যে অবস্থান এবং ভূমিকা, আগেও কি তেমন ছিল, ভবিষ্যতেও কি তেমন থাকবে? ওরা ‘হ্যাঁ’ ‘না’ দুটোই বলল, কিন্তু একমত হতে পারল না।

খুশি আপা বললেন, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন যখন ছোট ছিলেন, সমাজে নারীদের জন্য ছিল কঠোর পর্দাপ্রথা। তিনি নিজেও যখন খুব ছোট ছিলেন, তখন বাড়ির বাইরে তো বটেই, এমনকি বাড়ির ভেতরেও তাঁকে পর্দা মেনে চলতে হতো। তাঁর লেখা ‘অবরোধবাসিনী’ বইয়ে তিনি প্রায় একশ বছর আগেকার নারীদের অবরুদ্ধ অবস্থানের কথা কিছু কাহিনি বর্ণনার মাধ্যমে তুলে এনেছেন। বইয়ের শুরুতে তিনি বলেছেন, “গোটা ভারতবর্ষের কুলবালাদের অবরোধ কেবল পুরুষের বিরুদ্ধে নয়, মেয়েমানুষের বিরুদ্ধেও। অবিবাহিতা বালিকাদিগকে অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া এবং বাড়ির চাকরানি ব্যতীত অপর কোনো স্ত্রীলোক দেখিতে পায় না। বিবাহিতা নারীগণও বাজিকর-ভানুমতী ইত্যাদি তামাসাওয়ালী স্ত্রীলোকদের বিরুদ্ধে পর্দা করিয়া থাকেন। ” খুশি আপা ওদের ‘অবরোধবাসিনী’ থেকে কয়েকটা কাহিনি শোনালেন।

অবরোধবাসিনীর কাহিনি

১. এক বাড়িতে আগুন লেগেছিল। গৃহিণী বুদ্ধি করে তাড়াতাড়ি সব গয়না একটা বাক্সে ভরে ঘরের বাইরে বের হলেন। দরজায় এসে দেখলেন একদল পুরুষ আগুন নেভানোর চেষ্টা করছে। তিনি তাদের সামনে বের না হয়ে আবার ঘরের ভেতরে গিয়ে খাটের নিচে বসলেন। সেই অবস্থায় পুড়ে মরলেন। তবু পুরুষের সামনে বের হলেন না।

২. এক ভদ্রমহিলা ট্রেন বদলের সময় বোরকায় জড়িয়ে ট্রেন আর প্লাটফরমের মাঝখানে পড়ে গেলেন। স্টেশনে সে সময় তার গৃহপরিচারিকা ছাড়া আর কোনো নারী ছিল না। স্টেশনের কুলিরা তাকে তোলার জন্য এগিয়ে এলো। কিন্তু গৃহপরিচারিকা বললেন, "খবর্দার! কেউ বিবি সাহেবার গায়ে হাত দিয়ো না। " কিন্তু সে একা অনেক টানাটানি করেও কিছুতেই তাকে তুলতে পারল না। প্রায় আধাঘণ্টা অপেক্ষা করার পর ট্রেন ছেড়ে দিল। ট্রেনের চাকার তলায় পিষে তার দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

৩. একজন ডাক্তার গিয়েছেন রোগী দেখতে। ভদ্রমহিলার নিউমোনিয়া হয়েছে। তিনি ছিলেন পর্দার আড়ালে। ডাক্তার বললেন, স্টেথিস্কোপ লাগিয়ে ফুসফুসের অবস্থা দেখতে হবে; আমি পিঠের দিক থেকে দেখে নেব। কিন্তু ডাক্তারকে বলা হলো, স্টেথিস্কোপের নল গৃহপরিচারিকার হাতে দিতে। তিনি যেখানে যেখানে বলবেন, পরিচারিকা সেখানে নল রাখবে। তিনি পিঠে রাখবে বলে স্টেথিস্কোপের নলকে পর্দার ওপারে পাঠালেন। অনেকক্ষণ পরেও কোনো শব্দ শুনতে না পেয়ে পর্দা একটু সরিয়ে দেখলেন, নলটা কোমরে রাখা হয়েছে। তিনি বিরক্ত হয়ে ফিরে এলেন।

৪. জমিদার পরিবারের বিশ-পঁচিশজন মোটা মোটা কাপড়ের বোরকা পরা নারী হজে যাবার পথে কলকাতা স্টেশনে এলেন। তাদের স্টেশনের ওয়েটিং রুমে বসালে লোকে দেখতে পাবে। তাই প্লাটফরমে উপুর করে বসিয়ে মস্ত ভারী শতরঞ্জি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হলো। তাদের সঙ্গে থাকা হাজি সাহেব একটু দূরে দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে লাগলেন। তারা ওই অবস্থায় কয়েক ঘণ্টা থাকার পরে ট্রেন আসার সময় হলো। রেলের একজন কর্মচারী হাজি সাহেবকে তার আসবাবপত্র সরিয়ে নিতে বললেন। হাজি সাহেব বললেন, ওইসব আসবাব না, বাড়ির মেয়েরা। কর্মাচারীটি আবারও একটি 'বস্তায়' লাথি দিয়ে ওগুলো সরাতে বললেন। ভেতরে থাকা মেয়েরা লাথি খেয়েও টুঁ শব্দ করেনি।

৫. একবার এক লেডিস কনফারেন্স উপলক্ষে রোকেয়া আলীগড় গিয়েছিলেন। সেখানে এক ভদ্রমহিলার বোরকার প্রশংসা করায় তিনি বোরকা সম্পর্কে নিজের জীবনের কিছু অভিজ্ঞতার গল্প বললেন। একবার এক বাঙালি ভদ্রলোকের বাড়িতে বিয়ের নিমন্ত্রণে গিয়েছিলেন। সেখানকার ছেলে-মেয়েরা তাকে বোরকাসহ দেখে ভয়ে চিৎকার করে পালিয়েছিল। তিনি একবার কলকাতায় এসে আরও কয়েকজন বোরকাপরা নারীর সঙ্গে খোলা মোটরগাড়িতে পথে বের হয়েছিলেন। কলকাতার পথের ছেলেরাও তাদের ভূত মনে করে ছুটে পালিয়েছিল।

কাহিনি বলা শেষ হলে রূপা বলল, সেই সময় সব নারী কিন্তু অবরোধবাসিনী ছিল না। রোকেয়ার কথায় আমরা 'তামাশাওয়ালী' নারীদের কথা পেয়েছি, তারা নিশ্চয়ই লোকের বাড়ি ঘুরে ঘুরে মজার কিছু দেখাতেন। গণেশ বলল, ঠিক কথা, আমরা তো সেই সময় লেডিস কনফারেন্স হওয়ার কথাও পেলাম। খাদিজা বলল, ছোটবেলায় অবরোধবাসিনী হিসেবে কাটালেও বড় হয়ে রোকেয়া কিন্তু অনেক কাজ করেছিলেন! গৌতম বলল, সে জন্য

তাঁকে তো অনেক লড়াইও করতে হয়েছে। তাঁর মতো অবস্থানে গিয়ে ভূমিকা রাখাটা তখনকার নারীর জন্য নিশ্চয়ই স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না। গণেশ বলল, ওই সময় নারীর সামাজিক অবস্থান এবং ভূমিকা মূলত ঘরের মধ্যেই ছিল বলে মনে হচ্ছে। ঘরের বাইরের কাজে যারা এসেছে, তারা ব্যতিক্রমী।

খুশি আপা ওদের বললেন, এসব কাহিনি থেকে ওই সময়ের নারীদের অবস্থান এবং ভূমিকা কেমন ছিল বলে মনে করছি তা দলগতভাবে খুঁজে বের করি, চলো। ওরা কাজটি করে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করল।

প্রায় ১০০ বছর আগেকার নারীর সামাজিক অবস্থান	প্রায় ১০০ বছর আগেকার নারীর সামাজিক ভূমিকা

আমরাও দলগতভাবে কাজটি করি।

খুশি আপা বললেন, এবার আমরা এই সময়ের নারীদের ওপরে একটা তথ্যচিত্র দেখব এবং রিপোর্ট পড়ব।

কলসিন্দুর থেকে হিমালয়ে

সাফ নারী ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২২ এ বিজয়ী বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল

সাফ নারী ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের ২০২২ সালের আসরে স্বাগতিক নেপালকে ৩-০ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশের মেয়েরা। সাফ নারী ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের এই আসরে বাংলাদেশের মেয়েরা গোল করেছে মোট তেইশটি, হজম করেছে মাত্র একটি। সাফের ষষ্ঠ আসরের সবগুলো পুরস্কারই বাংলাদেশের ঝুলিতে। এই দলের আটজন খেলোয়াড় এসেছে ময়মনসিংহের কলসিন্দুর নামের এক অখ্যাত গ্রাম থেকে। ফুটবলকন্যাদের বদৌলতে কলসিন্দুর এখন সারা দেশের এক পরিচিত নাম। গ্রামীণ বালিকা থেকে সুপারস্টার হয়ে ওঠা এই মেয়েরা নিজেদের অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বপরিমণ্ডলে দেশের অবস্থানতেও নিয়ে গেছে এক অনন্য উচ্চতায়।

কলসিন্দুরের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের যে ছোট্ট মেয়েগুলোর কাছে "মেয়েরা ফুটবল খেলে" এই কথাই ছিল বিস্ময়ের, আজ ফুটবলের পঙ্খিরাজে চড়ে তারা নিজেরাই সবার কাছে বিস্ময়। অখ্যাত গ্রাম কলসিন্দুর থেকে হিমালয়কন্যা নেপালে গিয়ে সাফ জয়, যেমন ছিল পথটা— ২০১১ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ঘোষণা দেওয়া হয় 'বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুননেছা মুজিব গোল্ডকাপ টুর্নামেন্ট' আয়োজনের। ময়মনসিংহ জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী উপজেলা ধোবাউরার কলসিন্দুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক মফিজউদ্দিন খবরটা জানতে পেরে নিজের স্কুলের জন্য দল গঠনে লেগে যান। একে একে দলে যোগ দেয় সানজিদা, মারিয়া মান্দা, শিউলি আজিম, মার্জিয়া আক্তার, শামসুন্নাহার, তহুরা সাজেদা, শামসুন্নাহার জুনিয়র। মফিজউদ্দিন নিজেই ছিলেন প্রশিক্ষক। স্কুলের প্রধান শিক্ষক মিনতি রানি শীল দেখভালের দায়িত্ব নেন। ২০১২ সালে জেলায় বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুননেছা মুজিব গোল্ডকাপ টুর্নামেন্ট শুরু হলে কলসিন্দুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সেখানে অংশ নেয়। জাতীয় পর্যায়ে রানার্স আপ হয় তারা। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য শুরু করে নতুন করে প্রস্তুতি। মফিজউদ্দিন জানান, শুরুটা অনেক চ্যালেঞ্জিং ছিল। গ্রামের অভিভাবকরা

রক্ষণশীল। মেয়েদের ফুটবল খেলতে দেওয়ার কথা ভাবতেও পারত না। অভিভাবকদের বুঝিয়ে-শুনিয়ে রাজি করাতে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে তাঁকে। এরপর মেয়েদের নিয়ে যখন মাঠে নেমেছেন, অনেকেই ঠাট্টা-মশকারা করেছে। মেয়েদের নিয়ে অনেক সমালোচনা, আজেবাজে মন্তব্য করেছে। প্র্যাকটিসের সময় মাঠের আশপাশে থাকত উৎসুক মানুষের ভির। অনেকেই তাঁকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করত। তবে সাহায্য করতেও এগিয়ে এসেছেন অনেকে। লোকের তির্যক মন্তব্যের জবাব মুখে নয়, মাঠে দিতে চেয়েছিলেন তিনি। মেয়েরা পড়াশোনার পাশাপাশি স্কুল ছুটির পরও বন্ধের দিনে মাঠে প্রাকটিস করতে থাকে। শিক্ষক মফিজউদ্দিনের পরিশ্রম বৃথা যায়নি। ২০১৩ সালে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুননেছা মুজিব গোল্ডকাপ টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয় কলসিন্দুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। এরপরও একধিকবার তারা এই পদক জিতেছে। এই সময় স্থানীয় প্রশাসক ও ক্রীড়ামোদী ব্যক্তিদের নজরে আসে সানজিদা, মারিয়ারা। অল্প করে হলেও মিলতে থাকে সুযোগ-সুবিধা। ২০১৪ সালে এএফসি অনূর্ধ্ব ১৪ আঞ্চলিক চ্যাম্পিয়নশিপে চ্যাম্পিয়ন হয় বাংলাদেশ। সেখানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে মারিয়া মান্দা, শামসুন্নাহার জুনিয়র। কলসিন্দুর স্কুলের মেয়েদের এমন সাফল্য দেখে অন্য মেয়ে শিক্ষার্থীরাও ফুটবলে আগ্রহী হয়। দিন দিন বাড়তে থাকে কলসিন্দুর স্কুল টিমের সদস্য সংখ্যা। কলসিন্দুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক মিনতি রানি শীল জানান, শুরুতে প্রধান সমস্যা ছিল পোশাক নিয়ে সংকোচ। মেয়েরা প্রথমে সালোয়ার-কামিজ পরে খেলত। লোকলজ্জার ভয় দূর করে খেলার পোশাকে মেয়েদের মাঠে নামাতে অনেক সময় লেগেছে। সানজিদার বাবা লিয়াকত আলী জানান, মেয়ের আগ্রহ ও শিক্ষকদের কথার কারণে মেয়েকে ফুটবল খেলতে দিয়েছেন। গ্রামের লোকজন প্রথমে বিষয়টি ভালোভাবে নেয়নি। খেলোয়াড়দের নানা হুমকি-ধামকি দেওয়া হয়েছে। এমনকি নির্যাতনও করা হয়েছে। পরে যখন নারীদের ফুটবলে এগিয়ে যাওয়ার কারণে কলসিন্দুর গ্রামের নামডাক ছড়িয়ে পড়ে দেশ-বিদেশে, তখন সমস্যা অনেক কমেছে, সম্মান-স্বীকৃতিও মিলেছে। অজপাড়াগাঁয়ের কয়েকটা মেয়ে গ্রামের চেহারাই বদলে দিয়েছে। তাদের খ্যাতির কারণে সেখানে বিদ্যুৎ এসেছে, পাকা হয়েছে রাস্তাঘাট। তাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাকা ভবন হয়েছে, ফুটবলকন্যাদের বদৌলতে সরকারীকরণ হয়েছে কলসিন্দুর স্কুল এন্ড কলেজ। সেখানেও উঠেছে পাকা ভবন। দরিদ্র পরিবারের মেয়েগুলো নিজেদের সংসারে এনেছে স্বচ্ছলতা। তাদের কারণে আলোকিত হয়েছে এই জনপদ; মাথা উঁচু হয়েছে পুরো জাতির। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই মেয়েদের সংবর্ধনাসহ আর্থিক অনুদানও দিয়েছেন। এই কিশোরীদের গল্প উচ্চ মাধ্যমিক শাখার একাদশ শ্রেণির পাঠ্য বইয়ে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। 'দ্য আনবিটেন গার্লস' বা 'অপরাজিত মেয়েরা' শিরোনামে পাঠ্যবইয়ে একটি বিশেষ পাঠ রাখা হয়েছে। গারো পাহাড়ের পাদদেশের দরিদ্র পরিবারগুলো থেকে উঠে আসা ফুটবলার মেয়েদের সফলতার গল্প লেখা হয়েছে এই পাঠে। আরও কিছু ক্যাপশনসহ ছবি দেখে নিই।

সরকার পরিচালনায় নারী

আমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের ব্যাপার যে, মাত্রই ১৩০ বছর আগে আমাদের দেশের অধিকাংশ নারীর অবস্থান ছিল শুধু অন্তঃপুরে সেখানে আজ বাংলাদেশের সরকার পরিচালনাতেও নারীরা যোগ্যতার সাথে ভূমিকা রাখছেন। যদিও এখনো বাংলাদেশের অনেক নারীই তাদের অনেক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। কিন্তু সময়ের সাথে নারীর অবস্থার পরিবর্তনের এই ধারায় তাদের সামাজিক মর্যাদা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আজ আমরা এরকমই কয়েকজন নারী নেতৃত্বের কথা আলোচনা করবো যারা দেশের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন।

 শেখ হাসিনা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী	বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি সময় ধরে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন শেখ হাসিনা; ২০১৯ সালের ৭ জানুয়ারি শেখ হাসিনা চতুর্থবারের মত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। তিনি একজন মহীয়সী নারী। বাংলাদেশকে দারিদ্র্যের চক্র থেকে বের হয়ে এসে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার জন্য নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত। তিনি জনকল্যাণমুখী ও মানবতাবাদী কাজের জন্য বহু জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

 ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী এম.পি. মাননীয় স্পীকার, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ	ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী এম.পি., বাংলাদেশের প্রথম নারী স্পিকার। তিনি বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ স্পিকার হিসেবে সংসদে যোগ দিয়েছিলেন। ছাত্রজীবন থেকে রাজনীতি জীবন, সর্বত্রই তিনি অত্যন্ত মেধার ছাপ রেখেছেন।

ডা. দীপু মনি এম.পি.
মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশের প্রথম নারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বপালন করেছেন ডা. দীপু মনি এম.পি.। বর্তমানে তিনি দেশের প্রথম নারী শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে যোগ্যতার সাথে নেতৃত্ব দিচ্ছেন । তিনি একাধারে একজন রাজনীতিবিদ, একজন চিকিৎসক এবং একজন আইনজীবী।

সমাজের বিভিন্ন পরিসরে নারীর অগ্রযাত্রা

২০১২ সালের ১৯ মে প্রথম বাংলাদেশী নারী হিসেবে এভারেস্ট জয় করেন নিশাত মজুমদার।

বর্তমান বাংলাদেশের অনেক নারী ট্রেনচালক হিসেবে কাজ করছেন। কিন্তু প্রথম নারী ট্রেনচালক হিসেবে ২০০৪ সালে সালমা খাতুন যখন কাজ শুরু করেন। তখন অনেকের কাছেই সেটি ছিল বিস্ময়কর ঘটনা।

নারীরা বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের চালিকাশক্তি হয়ে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে শিল্পভিত্তিক অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করেছে। বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় আশি শতাংশ এই খাত থেকে আসে।

খুশি আপা জানতে চাইলেন, তথ্যচিত্র, রিপোর্ট এবং ছবিতে আমরা কোন সময়ের ঘটনা দেখলাম? ওরা উত্তর দিল, বর্তমান সময়ের ঘটনা। মাহবুব বলল, এই সময় সব নারীর অবস্থান এবং ভূমিকা তো এ রকম না! গণেশ বলল, হয়তো সমাজের বা পরিবারের অনেক বাধা এখনও আছে। কিন্তু এই সময়ের নারীদের এগিয়ে যাওয়ার সুযোগও আছে। আইন তাদের প্রায় সকল ক্ষেত্রে পুরুষের সমান অধিকার দিয়েছে, যেমনটা একশ বছর আগে ছিল না। সরকারও তাদের অবস্থানের উন্নয়ন এবং সামাজিক ভূমিকা বাড়ানোর জন্য অনেক কাজ করছে। রনি বলল, এখন নিশাতকে ১০০ বছর আগের মত প্রবল সামাজিক বাঁধার মুখে পরতে হচ্ছে না। কলসিন্দুরের মেয়েদের শুরুতে সমাজের মানুষ সমালোচনা করলেও সাফল্য আসার পর কিন্তু সবার সমর্থন ও শ্রদ্ধা পাচ্ছে।

খুশি আপা বললেন, আমরা রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের লেখা থেকে প্রায় ১০০ বছর আগেকার নারীর একটা চিত্র পেয়েছি আর এখানে আমরা বর্তমান সময়ের নারীর আরো একটা চিত্র পেলাম। চলো, দলগতভাবে এই সময়ের নারীর অবস্থান এবং ভূমিকা খুঁজে ছকে সাজিয়ে উপস্থাপন করি।

বর্তমান সময়ের নারীর সামাজিক অবস্থান	বর্তমান সময়ের নারীর সামাজিক ভূমিকা

উপস্থাপনের পর সালমা বলল, রোকেয়ার সময়ের নারীর সামাজিক অবস্থান ও ভূমিকা আর আজকের নারীর সামাজিক অবস্থান ও ভূমিকায় কত তফাত! হাচ্চা বলল, যে নারী একসময়ে পর্দার আড়ালে থাকত আজ সে জার্সি পরে খেলছে! মামুন বলল, সেই সমাজের অবরোধ প্রথার কারণে ট্রেনের তলায় চাপা পড়েছিল নারী, আজ সে ট্রেন চালাচ্ছে! খুশি আপা বলল, চলো দলে বসে খুঁজে দেখি, এই দুই সময়ের নারীর অবস্থান ও ভূমিকায় কোথায় কোথায় তফাত হয়েছে।

প্রায় ১০০ বছর আগেকার নারী	এখনকার সময়ের নারী

ওরা দলে কাজটি করে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করল।

চলো, আমরাও ওদের মতো ধারাবাহিকভাবে কাজগুলো করি।

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকার ওপর প্রভাব ফেলে

ফ্রান্সিস ক্লাসের বন্ধুদের গল্প বলছিল, “এক দুষ্টু রাজা ছিল। তার বাগানে পাখিরা ফল খেতে আসত। রাজা হুকুম করল, সব গাছ কেটে ফেল। পিঁপড়া চিনি খেয়েছে। রাজা আদেশ দিল, সব পিঁপড়ার পেট টিপে চিনি বের করে আনো। ” সবাই ফ্রান্সিসের ভঙ্গিমা দেখে আর গল্প শুনে হেসে কুটিপাটি! খুশি আপা বললেন, সত্যিকারের রাজা যদি অত্যাচারী হয়, তখন আর এমন হাসির সুযোগ হয় না। তিনি ওদের ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কাহিনি বললেন।

১৭৫৭ সালে পলাশীযুদ্ধের মাধ্যমে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার শাসন ক্ষমতা দখল করলেও নিজেরা শাসন ক্ষমতা হাতে নেয়নি। তারা নিজেদের আজ্ঞাবহ নবাবকে সিংহাসনে বসিয়ে রাখে। ১৭৬৫ সালে তারা দিল্লির সম্রাটের কাছ থেকে বাংলার রাজস্ব আদায়ের অনুমতি নেয়। যার ফলে রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকে নবাবের হাতে আর রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা চলে যায় ব্রিটিশদের হাতে। এই অবস্থাকে বলা হয় ‘দ্বৈত শাসনব্যবস্থা’।

শাসনব্যবস্থার এই বদল আরও অনেক বদল নিয়ে আসে। আগে রাজস্ব দেওয়া হতো ফসল দিয়ে, এবার তার বদলে অর্থ নেওয়া শুরু হলো। কৃষকদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করার জন্য তৈরি হলো জমিদার শ্রেণি। জমিদারদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করে ব্রিটিশ কোম্পানির কোষাগারে জমা দেওয়ার জন্য তৈরি হলো নাজিম শ্রেণি। এই তিন শ্রেণির অর্থনৈতিক চাহিদা মেটাতে সাধারণ মানুষের ওপর করের ভার এবং অত্যাচারের মাত্রা বাড়তেই থাকল। এর ফল হলো মারাত্মক। ইংরেজি ১৭৭০ সাল, বাংলা সালের ১১৭৬, বাংলাজুড়ে শুরু হলো ইতিহাসের ভয়াবহতম দুর্ভিক্ষ।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আনন্দমঠ উপন্যাসে তার বর্ণনা পাই। (খুশি আপা সহজ করে আনন্দমঠ থেকে ওদের বললেন) ১১৭৪ সালে ফসল ভালো হয় নাই, সুতরাং ১১৭৫ সালে চালের দাম বেড়ে গেল। সাধারণ মানুষের খুব কষ্ট হলো, কিন্তু রাজা কড়ায় গণ্ডায় রাজস্ব বুঝে নিলেন। রাজস্ব দিয়ে নি:স্ব প্রজা একবেলার বেশি খাবার পায়নি। ১১৭৫ সালে বর্ষাকালে বেশ বৃষ্টি হলো। লোকে ভাবল দেবতা বুঝি কৃপা করলেন। আনন্দে আবার রাখাল মাঠে গান গাইল, কৃষকপত্নী আবারও গয়নার আবদার করল। কিন্তু আশ্বিন মাসে দেবতা বিমুখ হলেন। আশ্বিন-কার্তিকে বিন্দুমাত্র বৃষ্টি পড়ল না। ধানক্ষেত শুকিয়ে খড় হয়ে গেল। অল্পবিস্তর যা ধান হয়েছিল তা রাজপুরুষরা সিপাহিদের জন্য কিনে রাখল। লোকে আর খেতে পেল না। প্রথমে একবেলা আধপেটা খাবার জুটত তারপর তিনবেলাই উপবাস। কিন্তু রাজস্ব আদায়ের কর্তা একেবারে শতকরা দশ টাকা রাজস্ব বাড়িয়ে দিল। বাংলায় কান্নার রোল পড়ে গেল।

লোকে প্রথমে ভিক্ষা করতে শুরু করল। তারপরে কে ভিক্ষা দেয়! শুরু হলো উপবাসের পালা। লোকে বীজধান খেয়ে ফেলল। গরু, লাঙল, জোয়াল, ঘরবাড়ি, জমি সব বিক্রি হতে লাগল। তারপর মেয়ে, ছেলে, স্ত্রী— সবই বেচতে শুরু করল। একসময়ে আর কেনার লোক নেই, সবাই কেবল বেচতে চায়। মানুষ গাছের পাতা-ঘাস-আগাছা খেতে লাগল, এমনকি কুকুর-ইঁদুর-বিড়ালও খাদ্য হলো। শুরু হলো মহামারি রোগ বসন্ত । কেউ কাউকে দেখার নেই, চিকিৎসা করার কেউ নেই। বাড়িতে একবার বসন্ত ঢুকলে রোগী ফেলে বাড়ির লোকেরা পালিয়ে যায়। ঘরে ঘরে পচতে থাকে মৃতদেহ।

এই দুর্ভিক্ষের সময় বাংলার তিন ভাগের এক ভাগ মানুষ অনাহারে, রোগে-শোকে মরে গিয়েছিল। তবু রাজস্ব আদায় আগের চেয়ে বেশি হয়েছিল। এ থেকে বোঝা যায়, ব্রিটিশ কোম্পানি সাধারণ মানুষের ওপর কী পরিমাণ অত্যাচার চালিয়েছিল! সে সময় কৃষক, কারিগরদের অনেকে বেকার হয়ে যায়। ঢাকার মসলিন শিল্পের অনেক কারিগর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বনে-জঙ্গালে পালিয়ে গিয়েছিল। অনেক মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরে যায়। ফলে শহরের ওপর চাপ বেড়ে যায়। বহু অঞ্চল জনশূন্য হয়ে জঙ্গালে পরিণত হয়। বাংলার সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবন ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়। খাবার আর অর্থের অভাবে মানুষ চুরি-ডাকাতি-লুটপাট শুরু করে। বাংলার সব জায়গায় আইন-শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ে। সাধারণ মানুষও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সেই সময় চলতে থাকা ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, কৃষক বিদ্রোহে কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষ ব্যাপকভাবে সহযোগিতা ও সমর্থন দেয়।

গণেশ জানতে চাইল, কেমন করে এই অবস্থার বদল ঘটল? খুশি আপা বললেন, তাহলে একটু গোঁড়া থেকেই শোনো, ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের পর ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তো ভারতবর্ষের শাসক হয়ে ওঠে, কিন্তু এই কোম্পানি ছিল কেবল একটি ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠান। শাসন কাজের অভিজ্ঞতা তাদের ছিল না। শুরুতে তাদের এদেশের ভাষা, দেশীয় রীতি-নীতি বুঝতে অসুবিধা হতো। এখানকার সমাজব্যবস্থা তো ব্রিটেনের মতো নয়। তাই ব্রিটিশ আইন-কানুন, ব্রিটিশ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা অনুযায়ী দেশটাকে চালানো সম্ভব ছিল না। আর সেই সময় বাংলা সম্পদশালী। তাই বাংলা থেকে পাওয়া রাজস্বই ছিল কোম্পানির ব্যবসার সবচেয়ে বড় মূলধন। শুরুতে দেশ শাসনের সুবিধার জন্য কোম্পানি একজন নওয়াব নিযুক্ত করে। নওয়াব দেশের নিজস্ব আইন-কানুন, রীতি-নীতির মাধ্যমে দেশ শাসন করবে আর একজন প্রতিনিধির মাধ্যমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নওয়াবের কাছ থেকে রাজস্ব সংগ্রহ করবে। তাতে তাদের দেশ শাসনের ঝামেলায়ও যেতে হয় না আবার টাকা-পয়সারও অভাব হয় না। এই ব্যবস্থাই 'দ্বৈত শাসন'।

কিন্তু ধীরে ধীরে নওয়াবের সঙ্গে কোম্পানির লোকদের বিরোধ শুরু হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের নামে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তারা বাংলার গ্রামে-গঞ্জে লুটপাট-অত্যাচার শুরু করে। এই সময় আসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। লোকের অভাবে বাংলার তিন ভাগের দুইভাগ চাষের জমি বন-জঙ্গল হয়ে ওঠে। এরপর শাসনক্ষমতা পুরোপুরি নিজেদের হাতে নিয়ে নেয় কোম্পানি। অবসান হয় দ্বৈত শাসনের। বাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটা বড় বদল আসে। এরপর কৃষকদের পাঁচ বছর মেয়াদে সরাসরি জমি ইজারা দেওয়া হয়। তাদের কাছ থেকে রাজস্ব সংগ্রহের জন্য ব্রিটিশ কালেক্টর নিযুক্ত হয়। কিন্তু এই পাঁচসালা বন্দোবস্তও বেশিদিন টেকেনি। উচ্চ হারে রাজস্ব দিতে না পেরে অনেক কৃষক পালিয়ে যায়, অনেকে হয়ে ওঠে বিদ্রোহী। গ্রামাঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমেই খারাপ হতে থাকে।

এরপর ১৭৭৭ সালে শাসনব্যবস্থায় ফিরে আসে জমিদারি প্রথা, যা ব্রিটিশ শাসনের আগে থেকেই এখানে চালু ছিল। প্রশাসনেও আসে অনক নতুন ব্যবস্থা। শুরুতে জমিদারি ব্যবস্থা বছর অনুযায়ী চুক্তিভিত্তিক থাকলেও ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিশ ঘোষণা দেয়, এরপরে এই চুক্তি হবে নিয়মিত খাজনা পরিশোধ সাপেক্ষে চিরস্থায়ী। অর্থাৎ যত দিন জমিদাররা নির্ধারিত হারে, সময়মতো রাজস্ব দিতে পারবে তত দিন বংশানুক্রমে তারা জমিদারি ভোগ করবে। এটিই 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' হিসেবে পরিচিত। কিন্তু জমিদাররাও এই ব্যবস্থায় খুশি ছিল না। কারণ একদিকে রাজস্বের উচ্চ হার অন্যদিকে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ফসলহানি, প্রাণহানি— যা-ই ঘটুক না কেন, এই ব্যবস্থায় খাজনা মওকুফের কোনো বিধান ছিল না। ফলে যে কোনো জমিদারি যেকোনো সময় নিলাম হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে গেল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে নতুন নতুন সামাজিক শ্রেণি তৈরি হয়— ছোট-বড় নতুন জমিদার, তালুকদার, জোতদার, নব্য ব্যবসায়ী ইত্যাদি। এসময়েও জমিদারদের অসন্তোষ-বিক্ষোভ, মামলা নিস্পত্তিতে বিচার বিভাগের ব্যর্থতা, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি— সবকিছু মিলে পরিস্থিতি বিশেষ ভালো হয়নি। ১৭৯৯ সালে জমিদারদের সন্তুষ্ট করতে কর আদায়ের জন্য প্রজাদের ওপর অত্যাচারের সীমাহীন স্বাধীনতা দেওয়া হয়। এর ফলে জমিদাররা ইচ্ছামতন কর আরোপ, বিচারের নামে নির্যাতন, সম্পদ-গবাদি পশু ক্রোক করা, এমনকি কোনো কৃষক কর না দিয়ে পালিয়ে গেলে তার গ্রামের সবাইকে জরিমানা করার মতো অন্যায়-অত্যাচার শুরু করে। এ সময় জমিদার ও প্রজাদের মাঝখানে অনেক মধ্যসত্ত্বভোগী শ্রেণির সৃষ্টি হয়।

ধীরে ধীরে ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে এদেশীয় জমিদারদের দূরত্ব কমে আসে। এর ফলে ভারতবর্ষের সিপাহি বিদ্রোহ, স্বদেশি আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সময় জমিদারদের সমর্থন ছিল ব্রিটিশদের পক্ষে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পেছনে ব্রিটিশ শাসকদের কিছু ইতিবাচক উদ্দেশ্যও ছিল। তারা ভেবেছিল, জমির ওপর জমিদারদের চিরস্থায়ী মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হলে জমিদার শ্রেণি নিজেদের স্বার্থেই কৃষিখাত, শিল্পখাত, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদির উন্নয়নে মনোযোগী হবে। কিন্তু সে প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। জমিদাররা কৃষিখাতে বিনিয়োগকে লাভজনক বলে মনে করেনি। তার চেয়ে খাদ্যশষ্যের ব্যবসা, জমি কেনা, বিলাসিতায় ব্যয় করাকে বেশি গুরুত্ব দেয়।

জমিদার শ্রেণি আবার আর একটি শ্রেণিকে নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকার বিনিময়ে জমিদারি ব্যবস্থাপনা আর নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দিয়ে দেয়। সেই শ্রেণি দেয় আবার আরেক শ্রেণিকে। সেই শ্রেণি আবার আরেক... এমনি করে স্তরে স্তরে অর্থ আদায় চলতে থাকে। তাদের সবার স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে প্রজাদের জীবন অসহনীয় হয়ে ওঠে। জমিদার থেকে প্রজার মাঝখানে মধ্যস্বত্বভোগীদের পনেরোটি স্তরও পাওয়া গিয়েছে। অর্থাৎ সামাজিক

শ্রেণির পিরামিডে সবার ওপরে জমিদার আর সবথেকে নিচে কৃষক, এর মাঝখানে আরও অনেকগুলো স্তর। এর মধ্যে প্রজাদের কাছ থেকে যারা কর আদায় করত তারা ছাড়া আর কারোর কোনো কাজ ছিল না। তারা কেবল চাষির ফসল আর অন্যান্য উৎপাদনের ওপর নির্ভরশীল একটা পরজীবী শ্রেণি হয়েই টিকে ছিল। অর্থাৎ উৎপাদনের কাজ করত চাষি আর এর ওপরের স্তরের সবাই তার কাছ থেকে শুষে নিত। এ যাবৎকালে বাংলায় কৃষক, তাঁতি, কারিগর শ্রেণির উচ্চ অবস্থান ছিল, ব্রিটিশরা ক্ষমতায় আসার পরে জমিদার, মহাজন, বেনিয়ারা সমাজে গুরুত্বপূর্ণ হলো। প্রজাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠার ফল সেই সময়ের নানান কৃষক বিদ্রোহ। দক্ষিণ বাংলার একটি এলাকার কৃষক বিদ্রোহের ঘটনা শোনো—

১৭৯২ সালে জমিদারদের আরোপিত অতিরিক্ত করের বিরুদ্ধে ঝালকাঠির সুগন্ধিয়া গ্রামের কৃষকরা বিদ্রোহী ভূমিকা নেয়। তারা কর দিতে অস্বীকার করে। তাদের নেতা ছিল 'বোলাকি শাহ্'। এই বিদ্রোহী কৃষকদের দমন করতে ব্রিটিশ সরকার সৈন্য পাঠায়। সৈন্যদের সঙ্গে লড়াইয়ে পরাজিত কৃষক নেতা বোলাকি শাহকে জেলে পাঠানো হয়। তার দলের বিদ্রোহী কৃষক ইদির, খিদির, ইসাফ— তিন ভাই পিরোজপুর মহকুমার উদয়তাড়া বুড়ির চর গ্রামে পালিয়ে আসেন। এরপর তুষখালী গ্রামকে কেন্দ্র করে আশপাশের গ্রামের কৃষকদের নিয়ে আবার নতুন করে আন্দোলন শুরু করেন। তাদের নেতৃত্বে সেখানকার কৃষকরাও জমিদারকে খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দেয়। তাদের স্লোগান ছিল, "ফিরিঙ্গিদের জমি না/খাজনাও তাই দিমু না। " আশপাশের তেইশটি গ্রামের মানুষ প্রতিবছর চৈত্র মাসে, খাজনা দেওয়ার সময় তুষখালি গ্রামে মিলিত হয়ে স্লোগান দিত, প্রতিবাদ করত। এখানে জমিদারদের সঙ্গে বিদ্রোহী কৃষকদের বারবার সংঘর্ষ হয়েছে। বহুবার জমিদারি হাতবদল করেও বিদ্রোহীদের দমানো যায়নি। ১৮৪০ সালে রাজস্ব আগের চেয়েও বাড়িয়ে দেওয়া হয়। ইদির, খিদির, ইসাফ ভাইদের নেতৃত্বে এরপর প্রায় বিশ বছর জমিদার-কৃষক খণ্ড খণ্ড লড়াই চলে। তিন ভাইয়ের মৃত্যুর পর ইদিরের ছেলে ইব্রাহিম এই কৃষক বিদ্রোহের নেতৃত্বে আসেন। জমিদারদের অতিরিক্ত করের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে হার না মানা এই কৃষকদের গ্রামগুলোকে শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার ১৮৭১ সালে সরকারী খাস জমি হিসেবে ঘোষণা করে। এই কৃষকরা তখন নানান স্তরের মধ্যস্বত্বভোগীদের পর্ব পেরিয়ে সরাসরি সরকারকে রাজস্ব দিতে শুরু করে।

এ রকম কৃষক আন্দোলন চলেছে মেদিনীপুর, ময়মনসিংহ, সন্দীপ, মেহেন্দীগঞ্জ, পাবনা, মুন্সিগঞ্জ আরও নানা জায়গায়। উনিশ শতকের আশির দশকে কৃষক বিদ্রোহ চরম আকার ধারণ করে। রাজস্ব আদায় এবং বিদ্রোহী কৃষকদের দমনের জন্য জেলা, মহকুমা, থানা স্থাপিত হয়। পুলিশ, কোর্ট, জেলখানা ইত্যাদি ব্যবস্থা আসে।

এসব বিদ্রোহ আর প্রতিরোধ আন্দোলনের কারণে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থার টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে ওঠে। মালিক জমিদার শ্রেণি প্রজাদের ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ হারাতে থাকে আর প্রজারা নিজেদের অধিকারের বিষয়ে সোচ্চার হতে শুরু করে। জমিদারদের জমিদারি বংশ পরম্পরায় বংশধররা পেত। ফলে জমিদারি ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত হতে শুরু করে। পারিবারিক কলহ-বিবাদ, জমিদারিতে অনুপস্থিতি, ব্যয়বাহুল্য ইত্যাদি নানা কারণে জমিদার শ্রেণির অবক্ষয় শুরু হয়। ফলে প্রায় ১০০ বছর আগে মধ্যবিত্ত শ্রেণি, জোতদার, হাওলাদার, বিত্তবান কৃষক ইত্যাদি শ্রেণির আবির্ভাব ঘটে।

১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের পর ব্রিটিশ কোম্পানির দেশ শাসনের ব্যর্থতা সুস্পষ্ট হয়। ভারতবর্ষের শাসনক্ষমতা সরাসরি ব্রিটিশ সরকারের হতে চলে যায়। ১৮৮৫ সালে আসে 'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন'। এই আইনে একদিকে জমিদারদের ক্ষমতা, সুযোগ-সুবিধা ছাঁটাই হয়। অন্যদিকে প্রজাদের দাবি-দাওয়া

অনেকাংশে মেনে নিয়ে প্রজাদের এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের অধিকার ও দায়দায়িত্বের কথা স্পষ্ট করে বলা হয়। কিন্তু সকল শ্রেণির কৃষকদের অধিকারের কথা বলা হয়নি।

১৯২০ সাল, এবার ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন মোড় নিয়ে আসে গণতান্ত্রিক নির্বাচনব্যবস্থা। সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচনের জন্য জনসংযোগের প্রয়োজন হয়। তাই এ সময় বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলো নিজ নিজ সংগঠনে কৃষক শাখা প্রতিষ্ঠিত করে। কৃষকরা সংগ্রামী কর্মীদের সংস্পর্শে সক্রিয় ও অধিকার সচেতন হয়ে ওঠে। এতকাল নিজের জমিতে গাছ কাটা, পুকুর কাটা, জমি বিক্রি বা বন্ধক দিতে হলে জমিদারকে সালামি দিতে হতো। নির্বাচনের রাজনীতির প্রবর্তন হলে বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রসার ঘটে। তখন অধ:স্তন কৃষকদের আইনগত অবস্থান সম্পর্কে জনমত সমালোচনামুখর হয়ে ওঠে। বাংলার কৃষকদের অধিকাংশই ছিল ভূমিতে অধিকারবিহীন। আইনসভায় বর্গাদারদেরও জমিতে অধিকার দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধন হলো ১৯২৮ সালে কিন্তু তাতেও বর্গাচাষিদের বিশেষ সুবিধা হলো না। তবে নতুন ব্যবস্থায় কেবল জমি হস্তান্তরে জমিদারকে সালামি দিতে হতো। জমিসংক্রান্ত অন্যান্য কাজে জমিদারের অনুমতির প্রথা বাতিল হলো। ১৯৩৫ সালে আসে কৃষক-প্রজা পার্টি। এই দলের নেতা এ কে ফজলুল হক বলেন, ক্ষমতায় গেলে আমরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা পুরোপুরি বিলুপ্ত করে দেব। ১৯৩৮ সালে ফজলুল হকের মন্ত্রীসভা এই আইনের আবার সংশোধনী আনে। সালামি ব্যবস্থা এবং

জমিদারের ক্রয়ের অগ্রাধিকার বন্ধ হয়। প্রজারা এবার জমির সত্যিকারের মালিক হয়। বর্গাচাষিদেরও কিছু কিছু অধিকার দেওয়া হয়। ১৯৪৬-৪৭ সালে হয় উত্তরবঙ্গের তেভাগা আন্দোলন। এর প্রতিক্রিয়ায় সে সময়ের বাংলা সরকারের প্রধান হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৯৪৭ সালে জমিদারি বিলোপ ও প্রজাস্বত্ব এবং বর্গাচাষীদের অধিকারের জন্য আইনসভায় দুটো বিল আনেন। কিন্তু দেশ বিভাগের কারণে দুটি বিল আর আইনে পরিণত করা যায়নি। এরপর ১৯৫০ সালে পূর্ববঙ্গ জমিদারি অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন আসে, যার অধীনে জমিদারি প্রথা পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের চিরস্থায়ী অবসান ঘটে। প্রজারা এবার জমির মালিক হিসেবে অভিহিত হয়। তারা সরাসরি সরকারকে খাজনা দিতে শুরু করে।

কাহিনি শেষে খুশি আপা জানতে চাইলেন, সামাজিক প্রেক্ষাপটের বদলের কোনো ঘটনা কি এখানে দেখতে পাচ্ছ? ওরা 'হ্যাঁ' বলল। নীলা বলল, রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ সমাজের গতিবিধি ঠিক করে দিচ্ছে। এখানে শাসন ব্যবস্থার বদলের কারণে সামাজিক প্রেক্ষাপটের বদল হয়েছে। সেইসঙ্গে বদল হয়েছে ব্যক্তির ভূমিকা ও অবস্থান। খুশি আপা বললেন, তার মানে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের বদলের কারণে সামাজিক প্রেক্ষাপটের বদল হয়েছে। চলো, আমরা দলে বসে খুঁজে দেখি এখানে কী কী ঘটেছে।

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের বদল	ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকার বদল	সামাজিক প্রেক্ষাপটের বদল

কাজ শেষে উপস্থাপনের পর ওরা বুঝল, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের বদলও ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকার বদল ঘটায়। তাতে সামাজিক প্রেক্ষাপটও প্রভাবিত হয়।

আমরাও ওদের মতো দলে বসে খুঁজে দেখি এবং প্রাপ্ত ফলাফল ক্লাসে উপস্থাপন করি।

হারুন: আমরা নিজেদের এলাকার রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটের বদল এবং সেখানে ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকা নিয়ে অনুসন্ধানী কাজ করি চলো।

অন্বেষা: যতটা সম্ভব বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের সাক্ষাৎকার নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করলে বেশি ভালো হবে।

ওরা দল তৈরি করে আলোচনার ভিত্তিতে গবেষণার জন্য তথ্যছক তৈরি করল।

আমার এলাকার রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন; ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকা			
নাম:			ঠিকানা:
বয়স:			
সময়কাল	রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট	সামাজিক প্রেক্ষাপট	আমার অবস্থান ও ভূমিকা

কাজ শেষে ওরা বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে ফলাফল উপস্থাপন করল। কেউ পোস্টার বানিয়েয়েছে কিংবা মাল্টিমিডিয়া কনটেন্ট বানিয়েছে। কেউ প্রতিবেদন লিখেছে, কেউবা আবার কমিক তৈরি করেছে। কেউ টাইমস্কেল তৈরি করেছে। একটা দল ছোট্ট একটা ভিডিও বানিয়েছে।

এসো, আমরাও ওদের মতো 'আমার এলাকার সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন; ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকা' শিরোনামে অনুসন্ধানী কাজ করি।

উপস্থাপন শেষে দেখা গেল, গত ৬০-৭০ বছরে বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত ক্ষেত্র, যোগাযোগ ব্যবস্থা, সংস্কৃতি (ঘরবাড়ি, পোশাক, খাদ্যাভ্যাস, শিল্পরুচি, অবসরযাপন), নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যাপক বদল এসেছে। নানা ক্ষেত্রে মানুষের অবস্থান ও ভূমিকায়ও এসেছে অনেক পরিবর্তন।

সেই সঙ্গে ওরা লক্ষ করল, সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট কেবল ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকায় প্রভাব ফেলে তা নয়; ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকাও সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে প্রভাব ফেলে। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শেখ মুজিবুর রহমান, বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা এর উদাহরণ। দেশে দেশে নানা সময় সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন; ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকা

খুশি আপা বললেন, নিজের এলাকার সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের বদল এবং সেখানে ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকা নিয়ে অসাধারণ কাজ হয়েছে! এবার আমরা বিশ্বের অন্যান্য দেশের বিষয়েও অনুসন্ধানী কাজ করতে পারি। গৌতম বলল, হ্যাঁ, আপা । ব্যক্তি নিজের অবস্থান থেকেও যেমন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বদলে ভূমিকা রেখেছে, তেমনি আবার সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের বদলও ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকা বদলে দিয়েছে। রনি বলল, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকা এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পারস্পরিক প্রভাব নিয়ে আমরা অনুসন্ধানী কাজ করতে পারি।

ওরা আলোচনার ভিত্তিতে অনুসন্ধানী কাজের জন্য কিছু বিষয় নির্ধারণ করল। বই-পত্রপত্রিকা-ইন্টারনেট ইত্যাদি মাধ্যম থেকে তথ্য সংগ্রহ করে কাজটি সম্পন্ন করল। বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে ওদের কাজের ফলাফল উপস্থাপন করল।

আমরাও নিজেদের মতো করে বিষয় নির্বাচন করে বিভিন্ন দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের বদল এবং ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকার সম্পর্ক নিয়ে অনুসন্ধানী কাজ করি।